بسم الله الرحمن الرحيم

# লন্ডনের মর্ডেনস্থ বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ০৩ মে, ২০১৯ মোতাবেক ০৩ হিজরত, ১৩৯৮ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

আজ আমি যেসব বদরী সাহাবীর স্মৃতিচারণ করব তাদের মাঝে প্রথম নাম হলো হযরত উবায়েদ। তার পুরো নাম ছিল হযরত উবায়েদ বিন আবু উবায়েদ আনসারী মুহ্সী। ইবনে হিশামের মতে তিনি অউস গোত্রের বনু উমাইয়া বংশোদ্ভুত ছিলেন। হযরত উবায়েদ মহানবী (সা.) এর সাথে বদর, উহুদ এবং খন্দকের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এর বেশি তার সম্পর্কে জানা যায় নি।

দ্বিতীয় যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন নোমান বিন বালদামা। হযরত আব্দুল্লাহ্-র দাদার নাম বালদামা বা বালযামা-ও বলা হয়ে থাকে। তিনি আনসারদের খাযরাজ গোত্রের বনু খুনাস বংশের সাথে সম্পর্ক রাখতেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন নোমান হযরত আবু কাতাদা-র চাচাতো ভাই ছিলেন। তিনি বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন উমায়ের। তিনি বনু জিদারা গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এক উক্তি অনুযায়ী তার পিতার নাম উমায়ের-এর পরিবর্তে উবায়েদও বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কেউ কেউ তার দাদার নাম আদী বর্ণনা করেছে, অপরদিকে কেউ কেউ হারেসা উল্লেখ করেছে। ইবনে হিশাম বনু জিদারাকে তার গোত্র হিসেবে উল্লেখ করেছেন, আর ইবনে ইসহাক বনু হারেসা বর্ণনা করেছেন। এদের উভয়েই ঐতিহাসিক।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আমর বিন হারেস। তিনি বনু হারেস গোত্রের সদস্য ছিলেন। কেউ কেউ তার নাম আমর বর্ণনা করেছেন, অথচ অন্যরা তার নাম আমেরও বলে থাকেন। তার উপনাম ছিল আবু নাফে। হযরত আমর প্রাথমিক যুগেই মক্কায় ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তিনি ইথিওপিয়ার দ্বিতীয় হিজরতে অংশ নিয়েছিলেন। তিনি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব। তিনি বনু মাযন গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল কাব বিন আমর আর মাতার নাম ছিল রুবাব বিনতে আব্দুল্লাহ্। তিনি হযরত আবু লায়লা মাযনি-র ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাবের এক পুত্রের নাম ছিল হারেস যিনি যুহায়বা বিনতে অউস এর গর্ভজাত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব বদরের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। বদরের যুদ্ধের দিন মহানবী (সা.) তাকে গনিমতের সম্পদের নিগরান নিযুক্ত করেছিলেন। এছাড়া অন্যান্য উপলক্ষ্যেও মহানবী (সা.) এর খোমোসের (যুদ্ধ লব্ধ সম্পদে আল্লাহ ও রসূলের জন্য নির্ধারিত এক পঞ্চমাংশ সম্পদের) নিগরান হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কাব উহুদ, খন্দক এবং এছাড়া অন্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে যোগদান করেন। হযরত উসমানের

খিলাফতকালে ৩৩ হিজরীতে মদিনায় তার মৃত্যু হয়। হযরত উসমান (রা.) তার জানাযার নামায পড়ান। তার উপনাম আবু হারেস এর পাশাপাশি আবু ইয়াহিয়া-ও বলা হয়ে থাকে।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস। তিনি বনু নাজ্জার গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার দাদার নাম সীরাত ও ইতিহাস গ্রন্থে অধিকাংশ ক্ষেত্রে খালেদ বর্ণিত হয়েছে, অবশ্য তাবাকাতুল কুবরায় তার নাম খালাদা লেখা হয়েছে। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস-এর পুত্রের নাম ছিল আব্দুর রহমান এবং কন্যার নাম ছিল উমায়রা। তাদের উভয়ের মায়ের নাম ছিল সুয়াদ বিনতে কায়েস। এছাড়া তার আরো এক কন্যা ছিলেন যার নাম ছিল উম্মে অউন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন কায়েস বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। আব্দুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন উমারা আনসারীর মতে তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন। কিন্তু অপর এক উক্তি অনুযায়ী তিনি উহুদের যুদ্ধে শহীদ হন নি, বরং তিনি জীবিত ছিলেন আর মহানবী (সা.) এর সাথে সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন এবং হযরত উসমান-এর খিলাফতকালে মৃত্যুবরণ করেন। ইতিহাসের গ্রন্থসমূহে কোথাও কোথাও মতভেদ পরিলক্ষিত হয়, তাই আমি সেগুলোও উল্লেখ করে দেই।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত সালামা বিন আসলাম। হযরত সালামা বিন আসলাম বনু হারেসা বিন হারেস গোত্রের সদস্য ছিলেন। তার পিতার নাম ছিল আসলাম। এক উক্তি অনুযায়ী তার দাদার নাম ছিল হারীশ, কিন্তু অপর উক্তি অনুযায়ী তার নাম ছিল হারীস। তার ডাকনাম ছিল আবু সাদ। হযরত সালামা বিন আসলাম এর মায়ের নাম ছিল সুয়াদ বিনতে রাফে। তিনি বদর, উহুদ, খন্দক বা পরিখা এবং এছাড়া অন্যান্য সকল যুদ্ধে মহানবী (সা.) এর সাথে অংশগ্রহণ করেন। তিনি বদরের যুদ্ধে সায়েব বিন উবায়েদ এবং নোমান বিন আমরকে বন্দি করেছিলেন। হযরত সালামা বিন আসলাম হযরত উমরের খিলাফতকালে জিসর্ এর যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন, যা ফোরাৎ নদীর তীরে সংঘটিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের বিস্তারিত বিবরণ আমি বিগত খুতবা সমূহে প্রদান করেছি। এটি অনেক বড় যুদ্ধ ছিল যা মুসলমান এবং ইরানীদের মাঝে সংঘটিত হয়েছিল। জিসর্ বলা হয় পুলকে। নদীর ওপর একটি পুল নির্মাণ করা হয়েছিল যার মাধ্যমে মুসলমানরা অন্য অঞ্চলে গিয়েছিল। আর এই যুদ্ধে ইরানীদের পক্ষ থেকে যুদ্ধের জন্য হাতীও ব্যবহৃত হয়েছিল। যাহোক এই যুদ্ধে উভয় পক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। বিশেষ করে মুসলমানদের অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। বিভিন্ন রেওয়ায়েতে মৃত্যুকালে তার বয়স ৩৮ বছরের কিছুটা কম বা বেশি বলা হয়ে থাকে।

আল্লামা নূরুদ্দিন হালবী-র প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সীরাতে হালবিয়ায় বদরের যুদ্ধের সময় মহানবী (সা.) এর মু'জিযা সমূহের প্রেক্ষিতে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধে হযরত সালামা বিন আসলাম এর তরবারি ভেঙে গেলে মহানবী (সা.) তাকে খেজুর গাছের ছড়ি দিয়ে বলেন যে, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। হযরত সালামা বিন আসলাম সেই ছড়ি হাতে নিতেই সেটি এক উৎকৃষ্ট তরবারিতে রূপ নেয় এবং পরবর্তীতে সেটি সবসময় তার কাছে সংরক্ষিত ছিল। 'শারাহ্ যুরকানী' এবং 'দালায়েলে নবুয়্যত' পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে যে, বদরের যুদ্ধের দিন হযরত সালামা বিন আসলাম এর তরবারি ভেঙে গেলে তিনি শূন্য হাতে ছিলেন। তার কাছে কোন অস্ত্র ছিল না। মহানবী (সা.) তাকে একটি ছড়ি দিয়ে বলেন যে, এটি দিয়ে যুদ্ধ কর। তখন তা এক উৎকৃষ্ট তরবারিতে রূপ নেয় যা জিসর্ এর যুদ্ধে শহীদ হওয়া পর্যন্ত তার কাছে ছিল।

ইবনে সাদ খন্দকের যুদ্ধের উল্লেখ করতে গিয়ে লিখেন যে, খন্দকের যুদ্ধের সময় মুহাজেরদের পতাকা হযরত যায়েদ বিন হারেসার কাছে ছিল, আর আনসারদের পতাকা ছিল হযরত সাদ বিন উবাদার কাছে। মহানবী (সা.) হযরত সালামা বিন আসলামকে দুই শত সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। সেসব পতাকার নীচে বিভিন্ন দল ছিল আর তাদের জন্য একেক জন করে নেতা নিযুক্ত করা হয়েছিল। হযরত সালামাকে দুই শত সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসাকে তিন শত সৈন্যের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত করা হয়েছিল। আর তাদেরকে তিনি (সা.) এই দায়িত্ব প্রদান করেন যে, তারা মদিনায় পাহারা দিবে এবং উচ্চস্বরে তকবীর পাঠ করতে থাকবে। এর কারণ হলো, শিশুদেরকে যেখানে নিরাপত্তার জন্য রাখা হয়েছিল সেখান থেকে বনু কুরায়যার পক্ষ হতে হামলা হওয়ার আশঙ্কা ছিল। মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার একটি ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লিখেন-

আহযাবের যুদ্ধে লাঞ্ছনাজনক পরাজয়ের স্মৃতি মক্কার কুরাইশদের দেহমনে আগুন লাগিয়ে রেখেছিল। আর স্বাভাবিকভাবেই এই হৃদয়াগ্নি আবু সুফিয়ানের মনে সবচেয়ে বেশি জ্বলছিল, যে কিনা মক্কার নেতা ছিল এবং পরিখার অভিযানে বিশেষভাবে লাঞ্ছনাজনক চপেটাঘাত খেয়েছিল। আবু সুফিয়ান এই ক্রোধাগ্নিতে কিছুকাল পর্যন্ত ভেতরে ভেতরে জ্বলতে থাকে। কিন্তু অবশেষে বিষয় তার সহ্যসীমার বাইরে চলে যায়। আর এই ক্রোধাগ্নির সুপ্ত স্ফুলিঙ্গ বেরিয়ে আসা আরম্ভ হয় এবং সেগুলো প্রকাশ পেতে থাকে। স্বাভাবিকভাবেই কাফেরদের সবচেয়ে বেশি শত্রুতা বরং আসল শত্রুতা ছিল মহানবী (সা.) এর সাথে। তাই আবু সুফিয়ান ভাবলো যে, যেখানে বাহ্যিক চেষ্টা, ষড়যন্ত্র এবং যুদ্ধের কোন ফলাফল প্রকাশ পায় নি তাই গোপনভাবে কোন ষড়যন্ত্র বা বাহানা ও ধূর্ততার আশ্রয় নিয়ে কেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর জীবনাবসান ঘটানো হবে না, কেন এমন কোন পরিকল্পনা করা হবে না? সে জানতো যে, মহানবী (সা.)-এর আশেপাশে বিশেষ কোন পাহারা থাকে না, বরং অনেক সময় তিনি সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় এখানে সেখানে যাতায়াত করতেন, শহরের অলিগলিতে চলাফেরা করতেন। মসজিদে নববীতে প্রত্যহ কমপক্ষে পাঁচবার নামাযের জন্য আসতেন। আর সফরের সময় সম্পূর্ণ অকৃত্তিম ও স্বাধীনভাবে থাকতেন। কোন ভাড়াটে হন্তারকের জন্য এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর কী হতে পারে? এ ধারণা হৃদয়ে জাগ্রত হতেই আবু সুফিয়ান সংগোপনে মহানবী (সা.)-কে হত্যার বাসনাকে চূড়ান্ত রূপ দেয়া আরম্ভ করে। এ ধারণায় দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর একদিন সুযোগ পেয়ে সে তার কাজে আসবে এমন কতিপয় কুরাইশী যুবককে বলে, তোমাদের মাঝে কি এমন কোন সাহসী পুরুষ নেই, যে মদিনায় গিয়ে গোপনভাবে মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যা করবে? তোমরা জান যে, মুহাম্মদ (সা.) প্রকাশ্যে মদিনার অলিগলিতে চলাফেরা করেন। সে নিজের মতো করে মহানবী (সা.) সম্পর্কে এসব কথা তুলে ধরে। সেই যুবকরা এই প্রস্তাব শুনে এবং এটিকে গ্রহণ করে, আর তাদের হৃদয়ে এ কথা ঘর করে নেয়। এ কথা প্রকাশ পাওয়ার স্বল্পকাল পর এক মরুবাসী যুবক আবু সুফিয়ানের কাছে আসে এবং বলে যে, আমি আপনার প্রস্তাব শুনেছি (কোন যুবক তাকে অবহিত করে থাকবে)। আমি এর জন্য প্রস্তুত আছি। আমি একজন দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি ও কাজে পরিপক্ক যার পাকড়াও কঠোর এবং হামলা তড়িৎ। আপনি যদি আমাকে এই কাজের জন্য মনোনীত করে আমার সাহায্য করেন তাহলে আমি মুহাম্মদ (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে যেতে প্রস্তুত আছি। আমার কাছে এমন একটি খঞ্জর আছে যা শিকারী শকুনের গোপন

পালকের মতো থাকবে। অর্থাৎ সেটিকে অনেক আড়ালে আবডালে রাখব। আমি মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর হামলা করব এবং এরপর পালিয়ে কোন কাফেলায় মিশে যাব। মুসলমানরা আমাকে ধরতে পারবে না। মদিনার পথঘাটও আমার নখদর্পনে। আবু সুফিয়ান অত্যন্ত আনন্দিত হয় এবং বলে যে, যথেষ্ট হয়েছে, তুমিই আমাদের কাজের লোক। অতঃপর আবু সুফিয়ান তাকে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রী ও পথখরচ দেয় এবং মদিনায় প্রেরণ করে আর নসীহত করে যে, এই গোপন কথা কারো কাছে প্রকাশ পেতে দেবে না।

মক্কা থেকে বিদায় নিয়ে এই ব্যক্তি দিনে আত্মগোপন করে আর রাতে সফর করে মদিনার দিকে অগ্রসর হয়। ষষ্ঠ দিন সে মদিনা পৌঁছে যায় আর মহানবী (সা.) এর ঠিকানা জিজ্ঞেস করতে করতে সোজা বনু আব্দিল আশআল গোত্রের মসজিদে পৌঁছে যেখানে তখন মহানবী (সা.) উপস্থিত ছিলেন। সেই দিনগুলোতে যেহেতু নিত্যনূতন মানুষ মদিনায় আনাগোনা করত তাই তার আগমনের উদ্দেশ্যে সম্পর্কে কোন মুসলমানের সন্দেহ হয় নি যে, সে কোন্ উদ্দেশ্যে এসেছে। কিন্তু যখনই সে মসজিদে প্রবেশ করে, মহানবী (সা.) তাকে নিজের দিকে অগ্রসর হতে দেখে বলেন, এই ব্যক্তি কোন মন্দ উদ্দেশ্যে এসেছে। মহানবী (সা.) উচ্চস্বরে এই কথা বলেছিলেন যা সেই ব্যক্তির কানেও পৌঁছে। এই কথা শুনে সে আরো দ্রুত তাঁর (সা.) দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু একজন আনসারী নেতা উসায়েদ বিন হুযায়ের তাৎক্ষণিকভাবে লাফিয়ে তাকে চেপে ধরেন। ধস্তাধস্তিতে তার হাত সেই ব্যক্তির লুকানো ছুরির ওপর গিয়ে পড়ে। তখন সে বিচলিত হয়ে বলে উঠে যে, আমার রক্ত, আমার রক্ত। অর্থাৎ আমাকে তুমি আহত করে দিয়েছে। যখন তাকে কাবু করে ফেলা হয় তখন মহানবী (সা.) তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, সত্যি করে বল তুমি কে এবং কোন্ উদ্দেশ্যে এখানে এসেছ? সে বলে, আমায় প্রাণ ভিক্ষা দেয়া হলে আমি বলব। তিনি (সা.) বলেন, ঠিক আছে, যদি তুমি সমস্ত কথা সত্যি করে বল তাহলে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। তখন সে পুরো ঘটনা হুবহু মহানবী (সা.) এর কাছে বর্ণনা করে আর এ কথাও বলে যে, আবু সুফিয়ান তার সাথে এত পরিমাণ পুরস্কারের ওয়াদা করেছিল। অতঃপর সেই ব্যক্তি কয়েক দিন পর্যন্ত মদিনায় অবস্থান করে। আর এরপর স্বেচ্ছায় মহানবী (সা.) এর কথা শুনে আর মুসলমানদের সাথে থেকে মহানবী (সা.) এর অনুসারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করে।

আবু সুফিয়ানের এই খুনের ষড়যন্ত্র মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবগত ও অবহিত থাকার বিষয়টিকে আরো বেশি আবশ্যক করে তুলে, অর্থাৎ এটি জানা আবশ্যক হয়ে যায় যে, তাদের নিয়্যত কী, কেননা তারা গোপন ষড়যন্ত্র করছে। অতএব মহানবী (সা.) এ উদ্দেশ্যে নিজের দুই জন সাহাবী আমর বিন উমাইয়্যা যামরি এবং যার স্মৃতিচারণ হচ্ছে তাকে অর্থাৎ সালামা বিন আসলামকে, মক্কা অভিমুখে প্রেরণ করেন এবং আবু সুফিয়ানের হত্যার ষড়যন্ত্র এবং তার পূর্বের রক্তক্ষয়ী কার্যক্রমের প্রেক্ষিতে তাদেরকে এই অনুমতিও প্রদান করেন যে, সুযোগ পেলে যেন ইসলামের এই চরম শত্রুকে হত্যা করে। কিন্তু যখন উমাইয়্যা এবং তার সাথি মক্কায় পৌঁছেন তখন কুরাইশরা সতর্ক হয়ে যায়। আর এই উভয় সাহাবী নিজেদের প্রাণ রক্ষা করে মদিনা অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তারা কুরাইশদের দু'জন গুপ্তচরকে পেয়ে যান যাদেরকে কুরাইশ নেতারা মুসলমানদের গতিবিধি সম্পর্কে জানার জন্য এবং মহানবী (সা.) এর অবস্থা অবগত হওয়ার জন্য প্রেরণ করেছিল। এটিও অসমম্ভব নয় যে, কুরাইশদের এই পরিকল্পনাও হয়ত হত্যার অন্য কোন ষড়যন্ত্রের সূচনা হবে। যেমনটি তারা পূর্বেও এক ব্যক্তিকে প্রেরণ করেছিল, হতে পারে একই উদ্দেশ্যে তাদেরকেও প্রেরণ

করেছে, অর্থাৎ তারা ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নাঊযুবিল্লাহ্ মহানবী (সা.)-কে যেন হত্যা করে। কিন্তু খোদার এমন কৃপা হয়েছে যে, উমাইয়্যা এবং সালামা বিন আসলাম তাদের গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে জেনে যান, যার কারণে তারা এই গুপ্তচরদের ওপর আক্রমণ করে তাদেরকে বন্দি করতে চান। কিন্তু তারাও প্রতিরোধ গড়ে। অতএব এই লড়াইয়ে একজন গুপ্তচর নিহত হয় আর দ্বিতীয় জনকে বন্দি করে তারা নিজেদের সাথে মদিনায় নিয়ে যান।

এই অভিজানের ইতিহাস সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনে হিশাম এবং তাবরী এটি ৪ হিজরীতে হয়েছে বলে উল্লেখ করেছেন, কিন্তু ইবনে সাদ এটিকে ৬ হিজরীতে উল্লেখ করেছেন। আল্লামা কুসতালানি এবং যুরকানি ইবনে সাদ-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এদের সবার মতের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লিখেন, অতএব আমিও এটিকে ৬ হিজরী উল্লেখ করেছি, বাকি আল্লাহ্ তা'লা ভালো জানেন, **ওয়াল্লাহু আ'লামু**। বায়হাকীও ইবনে সাদের বর্ণিত বিষয়ের সমর্থন করেছেন, কিন্তু তাতে এই ঘটনার সময় সম্পর্কে জানা যায় না।

হুদায়বিয়ার সন্ধির ক্ষেত্রে হযরত সালামা বিন আসলামের উল্লেখ এভাবে পাওয়া যায় যে, হযরত উম্মে আম্মারা বর্ণনা করেন যে, আমি হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন মহানবী (সা.)কে দেখছিলাম। তখন তিনি বসেছিলেন আর হযরত আব্বাদ বিন বিশর এবং হযরত সালামা বিন আসলাম উভয়ে লৌহ শিরস্ত্রান পরিহিত অবস্থায় মহানবী (সা.) এর পাশে দাঁড়িয়ে পাহারা দিচ্ছিলেন। কুরাইশদের দূত সোহেল বিন আমর নিজ কণ্ঠস্বর উঁচু করলে তারা উভয়ে তাকে বলেন যে, নিজের কণ্ঠস্বর মহানবী (সা.) এর সামনে নীচু রাখ বা ধীর রাখ অথবা হালকা রাখ। এটি তার এক বিশেষ সেবার উল্লেখ, যা এই উপলক্ষ্যে বর্ণিত হয়েছে।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হবে তার নাম হলো হযরত উকবা বিন উসমান। তার মায়ের নাম ছিল উম্মে জামিল বিনতে কুতবা। হযরত উকবা আনসারদের বনু যুরায়েক গোত্রের সদস্য ছিলেন। তিনি এবং তার ভাই হযরত সাদ বিন উসমান বদর এবং উহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বর্ণিত রয়েছে যে, উহুদের যুদ্ধের সময় হামলার প্রচণ্ডতায় যে কয়েকজন সাময়িকভাবে পিছনে চলে যায় তাদের মাঝে দুইজন হযরত উকবা বিন উসমান এবং হযরত সাদ বিন উসমানও ছিলেন। এমনকি তারা আহওয়ায এর বিপরীত দিকে অবস্থিত একটি পাহাড় জিলা-য় পৌঁছে যান আর তিন দিন সেখানে অবস্থান করেন। আহওয়ায মদিনা থেকে কয়েক মাইল দূরবর্তী একটি স্থান। এরপর যখন তারা উভয়ে মহানবী (সা.) সমীপে উপস্থিত হয়ে এ কথার উল্লেখ করেন তখন মহানবী (সা.) বলেন, **লাকাদ যাহাবতুম ফীহা আরীযা**। অর্থাৎ তোমরা সেদিকে গিয়েছ যেখানে ছিল প্রশস্ততা। যাহোক মহানবী (সা.) তাদের ভুলভ্রান্তি উপেক্ষা করেন এবং তাদের মার্জনা করেন কোন জিজ্ঞাসাবাদ করেন নি।

এরপর যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো আব্দুল্লাহ্ বিন সাহাল। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সাহাল বনু জহুরা গোত্রের সদস্য ছিলেন যা ছিল বনু আশআল্ গোত্রের মিত্র। এটিও বলা হয়ে থাকে যে, তিনি গাস্সানী ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ্র নাম কেউ যায়েদ এবং কেউ রাফেও বর্ণনা করেছেন। হযরত আবদুল্লাহ্র মায়ের নাম ছিল সওবা বিনতে তাইয়্যেহান, যিনি ছিলেন হযরত আবুল হায়সাম বিন তাইয়্যেহানের বোন। তিনি হযরত রাফে বিন সাহল-এর ভাই ছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন। তার ভাই হযরত রাফে তার সাথে ওহুদ ও পরিখার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আব্দুল্লাহ্

খন্দকের যুদ্ধে শহীদ হন। বনু ওয়ায়েফ এর এক ব্যক্তি তিরের আঘাতে তাকে শহীদ করেছিল। মুগীরা বিন হাকিম বর্ণনা করেন, আমি আবদুল্লাহ্‌কে জিজ্ঞেস করি, আপনি কি বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন? তিনি উত্তরে বলেন, হ্যাঁ। আমি আকাবার বয়আতের সময়ও উপস্থিত ছিলাম। হযরত আব্দুল্লাহ্‌র হামরাউল আসাদের (যা মদিনার ৮ মাইল দূরে অবস্থিত একটি স্থান) যুদ্ধে অংশগ্রহণের উল্লেখও মহানবী (সা.) এর জীবনী সংক্রান্ত বই সোবেলুল হুদা-তে এভাবে দেখা যায় যে, হযরত আবদুল্লাহ্ বিন সাহাল এবং হযরত রাফে বিন সাহাল ভ্রাতৃদ্বয়, যারা বনি আশআল গোত্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন; তারা উভয়েই যখন ওহুদের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসেন তখন তারা মারাত্মকভাবে আহত ছিলেন; অর্থাৎ যুদ্ধে আহত। হযরত আব্দুল্লাহ্ বেশি আহত ছিলেন। এই ভ্রাতৃদ্বয় যখন মহানবী (সা.) এর হামরাউল আসাদের দিকে গমন এবং এতে অংশগ্রহণ করার বিষয়ে তাঁর নির্দেশ সম্পর্কে অবগত হন তখন তাদের একজন অন্যজনকে বলেন, খোদার কসম, যদি আমরা মহানবীর সাথে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে না পরি তাহলে এটি অনেক বড় একটি বঞ্চনা হবে। আহত ছিলেন কিন্তু তাসত্ত্বেও একটি আন্তরিক প্রেরণা ছিল, ঈমানের দৃঢ়তা ছিল। অতঃপর বলেন, খোদার কসম, আমাদের কাছে কোন বাহনও নেই যাতে আমরা আরোহন করব, আর আমরা এটিও জানি না যে, কীভাবে আমরা এ কাজ করব। হযরত আব্দুল্লাহ্ বলেন, আস আমরা পদব্রজে যাব। হযরত রাফে বলেন, খোদার কসম, আঘাতের কারণে আমার চলৎশক্তিও নেই। তার ভাই বলেন আস আমরা ধীরে ধীরে হাঁটি আর মহানবী (সা.) এর পানে অগ্রসর হই। তারা উভয়েই যাত্রা করেন। হযরত রাফে দুর্বলতা অনুভব করেন। একবার হযরত আব্দুল্লাহ্ রাফেকে পিঠে বহন করেন আরেক বার তিনি পায়ে হাঁটেন। দুজনেই আহত ছিলেন কিন্তু যিনি তুলনামূলকভাবে ভালো ছিলেন তিনি বেশি আহতজনকে পিঠে উঠিয়ে নিতেন, আর মহানবী (সা.) এর দিকে অগ্রসর হতে থাকেন। দুর্বলতার কারণে কোন কোন সময় অবস্থা এমন হতো যে, নড়াচড়াও করতে পারতেন না। এমনকি এক পর্যায়ে উভয়েই এশার সময় মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থিত হন। সাহাবীরা রাতের বেলা তখন সাময়িক শিবির স্থাপন করে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করছিলেন। তাদের উভয়কে মহানবী (সা.) এর সকাশে উপস্থাপন করা হয়। সে রাতে মহানবী (সা.) এর পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন হযরত আব্বাদ বিন বিশর। তারা উভয়ে যখন সেখানে পৌঁছেন তখন মহানবী (সা.) তাদের উভয়কে জিজ্ঞেস করেন তোমাদের বিলম্বের কারণ কী? তারা এর কারণ কী ছিল তা মহানবী (সা.)-কে অবহিত করেন। তখন মহানবী (সা.) তাদের উভয়ের কল্যাণ কামনা করে দোয়া করতে গিয়ে বলেন, যদি তোমরা দীর্ঘজীবন লাভ কর তাহলে তোমরা দেখবে যে, বাহন হিসেবে তোমাদের ঘোড়া খচ্চর ও উট লাভ হবে। এখন তোমরা কষ্টেসৃষ্টে পায়ে হেঁটে এসেছ; কিন্তু দীর্ঘজীবি হলে দেখবে যে, এসব বাহন তোমাদের নাগালের ভেতর রয়েছে। একই সাথে তিনি (সা.) এ কথাও বলেন যে, কিন্তু তা তোমাদের এই সফর থেকে উত্তম হবে না যা তোমরা পদব্রজে কষ্টেসৃষ্টে করেছে। এর যে পুণ্য আর প্রতিদান তোমরা পাবে আর এর যে কল্যাণ, তা অনেক বেশি।

হামরাউল আসাদ-এর যুদ্ধ কি ছিল যাতে যোগদানের জন্য তারা মহানবী (সা.) এর পেছনে পেছনে গিয়েছেন- এ সম্পর্কে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব কিছুটা বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। তিনি লিখেন যে,

মহানবী (সা.) ও তাঁর সাহাবীদের ওহুদের যুদ্ধ হতে প্রত্যাবর্তন এবং হামরাউল আসাদের যুদ্ধের বিস্তারিত চিত্র হলো, মদিনার জন্য ওহুদের যুদ্ধের দিবাগত রাত খুবই ভীতিপূর্ণ একটি রাত ছিল, কেননা যদিও বাহ্যত কুরাইশ বাহিনী মক্কার পথে পাড়ি জমিয়েছিল কিন্তু আশঙ্কা ছিল যে, কোথাও এ কাজ মুসলমানদের অপ্রস্তুত করে তোলার জন্য নয় তো! বাহ্যত তারা ওহুদের যুদ্ধে জয়যুক্ত হয়ে মক্কা ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু মুসলমানদের উৎকণ্ঠা ছিল যে, কোথাও মদিনায় হামলার জন্য পুনরায় ফিরে আসার ষড়যন্ত্র নয় তো আর আকস্মিকভাবে ফিরে এসে মদিনায় আক্রমণ করবে না তো? এই সাবধানতা বশত এবং সন্দেহের কারণে মদিনায় এ রাতে পাহারার ব্যবস্থা নেয়া হয় আর সাহাবীরা পুরো রাত বিশেষভাবে মহানবী (সা.) এর ঘরের পাহারার ব্যবস্থা করেন।

প্রভাতে জানা যায় যে, এই সন্দেহ অলীক ছিল না; কেননা ফজরের নামাযের পূর্বে মহানবীর কাছে সংবাদ পৌঁছে যে কুরাইশ বাহিনী মদিনার কয়েক মাইল দূরে যাত্রা বিরতি দিয়েছে আর কুরাইশ নেতাদের মাঝে জোরালে বিতর্ক চলছে যে, এই বিজয়কে পুঁজি করে মদিনায় কেন হামলা করা হবে না। কতক কুরাইশ পরস্পরকে খোঁচা দিচ্ছিল যে, তোমরা মুহাম্মদ (সা.)-কেও হত্যা করনি আর মুসলমান নারীদের দাসীও বানাও নি আর তাদের ধনসম্পদও করতলগত করনি, বরং যখন তোমরা জয়যুক্ত হয়েছে, তাদের নিশ্চিহ্ন করার সুযোগ পেয়েছ, তোমরা তাদের এমনিতেই ছেড়ে দিয়ে ফিরে এসেছ যেন তারা আবার শক্তিশালী হয়ে উঠে! তাই এখনও সুযোগ আছে, ফেরত যাও আর মদিনার ওপর হামলা করে মুসলমানদের মূল কেটে দাও। পক্ষান্তরে অপর কতক এটিও বলে যে, তোমাদের একটি বিজয় লাভ হয়েছে সেটিকে গণিমত জ্ঞান কর এবং মক্কায় ফিরে যাও। কোথাও এমনটি যেন না হয় যে, যেই খ্যাতি তোমরা অর্জন করেছ তাও হাতছাড়া করে বস আর এই বিজয় পরাজয়ে না পর্যাবসিত হয়ে যায়। কেননা এখন যদি তোমরা ফিরে যাও আর মদিনায় হামলা কর তাহলে মুসলমানরা প্রাণান্তকর যুদ্ধ করবে আর যারা ওহুদে অংশগ্রহণ করেনি তারাও যুদ্ধক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু অবশেষে উচ্ছ্বসিত লোকদের দৃষ্টিভঙ্গি জয়যুক্ত হয় আর কুরাইশরা মক্কায় ফিরে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। মহানবী (সা.) যখন এসব ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হন তিনি তাৎক্ষণিকভাবে ঘোষণা করেন যে, মুসলমানরা যেন প্রস্তুত হয়ে যায় কিন্তু একই সাথে এই নির্দেশও দেন যে, যারা ওহুদে অংশগ্রহণ করেছে তারা ব্যতীত অন্য কেউ যেন আমাদের সাথে বের না হয়। অতএব ওহুদের মুজাহিদগণ, যাদের অধিকাংশ আহত ছিলেন, (দু'জনের কথা আমি উল্লেখ করেছি) তারা নিজেদের যখম বেধে নিজেদের মনিবের সাথে যোগ দেন। আর লেখা রয়েছে যে, এসময় মুসলমানরা এমন আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের সাথে বের হয় যেভাবে কোন বিজয়ী বাহিনী বিজয়ের পর শত্রুকে ধাওয়া করার জন্য বের হয়। ৮ মাইল দূরত্ব অতিক্রম করে তিনি (সা.) হামরাউল আসাদ পৌঁছেন, সেখানে ময়দানে পড়ে থাকা দুজন মুসলমানের লাশ তারা পান। অনুসন্ধানে জানা যায় যে, তারা ছিল গুপ্তচর, যাদেরকে মহানবী (সা.) কুরাইশদের পেছনে প্রেরণ করেন। কিন্তু কুরাইশরা সুযোগ পেয়ে তাদের হত্যা করে। মহানবী (সা.) একটি কবর খুঁড়িয়ে তাদেরকে একসাথে দাফন করিয়ে দেন। যেহেতু সন্ধ্যা নেমে এসেছিল তাই তিনি সেখানে শিবির স্থাপনের নির্দেশ দেন এবং বলেন ময়দানের বিভিন্ন স্থানে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোক এবং বিস্তীর্ণ জায়গায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোক। স্বল্পতম সময়ের ভেতর হামরাউল আসাদের ময়দানে ৫০০ অগ্নি জ্বলে উঠে যা দূর থেকে অবলোকনকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে প্রতাপান্বিত করতো। এটি বড়ই প্রভাব

সৃষ্টি করেছিল। মানুষ ধরে নেয় যে, এটি একটি জনবসতি। বড়বড় তাবু দাঁড় করানো রয়েছে। খুব সম্ভব তখনই খুযাআ গোত্রের মাবাদ নামের এক পৌত্তলিক নেতা মহানবী (সা.) এর কাছে আসে এবং ওহুদের নিহত লোকদের কথা বলে তাঁর প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে আর পুনরায় নিজের পথে এগিয়ে যেতে থাকে। দ্বিতীয় দিন যখন সে মদিনার ৪০ মাইল দূরে রওহা নামক স্থানে পৌঁছে তখন দেখে যে, কুরাইশ বাহিনী সেখানে শিবির স্থাপন করেছে, যারা তর্ক-বিতর্কের পর মদিনা থেকে ফিরে আসছিল আর মদিনা অভিমুখে ফিরে যাওয়ার প্রস্তুতি চলছে। মাবাদ তাৎক্ষণিকভাবে আবু সুফিয়ানের কাছে যায় আর তাকে গিয়ে বলে তুমি কী করতে যাচ্ছ? খোদার কসম, আমি এখনই মুহাম্মদ (সা.) এর বাহিনীকে হামরাউল আসাদে রেখে এসেছি। এমন প্রতাপান্বিত বাহিনী আমি কখনো দেখিনি যারা ওহুদের পরাজয়ের গ্লানিতে এতটা উত্তেজিত যে, তোমাদের দেখলেই ভস্মীভূত করে ফেলবে, খেয়ে ফেলবে, নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আবু সুফিয়ান ও তার সাথীদের ওপর মাবাদের এসব কথার এতটা প্রতাপ ছেয়ে যায় যে, তারা মদিনা অভিমুখে যাত্রার ধারণা পরিত্যাগ করে অনতিবিলম্বে মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। মহানবী (সা.) এভাবে কুরাইশ বাহিনীর প্রস্থানের সংবাদ প্রাপ্ত হলে তিনি খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আর বলেন এটি খোদার প্রতাপ যা তিনি কাফেরদের হৃদয়ে সঞ্চার করেন। এরপর তিনি আরো ২-৩ দিন হামরাউল আসাদে অবস্থান করেন এবং ৫ দিনের অনুপস্থিতির পর মদিনা ফিরে আসেন।

পরবর্তী যে সাহাবীর স্মৃতিচারণ হচ্ছে তার নাম হলো হযরত উতবা বিন রাবিআ। হযরত উতবার সম্পর্ক কোন্ গোত্রের সাথে ছিল সে সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মাঝে মতভেদ রয়েছে। ইবনে ইসহাক বলেন, হযরত উতবা বিন রাবিআ বনু লোযান গোত্রের মিত্র ছিলেন আর তার সম্পর্ক ছিল বাহরা গোত্রের সাথে। কারো কারো মতে তিনি অওস গোত্রের মিত্র ছিলেন। যাহোক তিনি বদর এবং ওহুদের যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করেন। আল্লামা ইবনে হাজার আসকালানী বর্ণনা করেন, ইয়ারমুকের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আমীরদের একজনের নাম উতবা বিন রাবিআ বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি বলেন, আমার মতে ইনিই সেই সাহাবী। ইয়ারমুকের যুদ্ধের বিশদ বিবরণ হলো, ১২ হিজরীতে হযরত আবু বকর (রা.) যখন হজ্ব আদায়ের পর মদিনায় ফিরে আসেন তখন তিনি ১৩ হিজরীর সূচনাতে মুসলমান বাহিনীকে সিরিয়ার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। যেমন, আমর বিন আসকে ফিলিস্তিন অভিমুখে, ইয়াযিদ বিন আবু সুফিয়ান, হযরত ওবায়দা বিন আলজারাহ ও হযরত শারাহ্‌বিল বিন হাসানাকে সিরিয়ান মালভূমির ইয়ালকা হয়ে তবুকিয়া চলে যাওয়ার নির্দেশ দেন। হযরত আবু বকর প্রথমে হযরত খালেদ বিন সাদকে আর পরে তার স্থানে ইয়াযীদ বিন সুফিয়ানকে আমীর নিযুক্ত করেন। তারা ৭ হাজার মুজাহেদের সাথে সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করেন। ইসলামী বাহিনীর আমীরগণ নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে সিরিয়া পৌঁছেন। হেরাকেল নিজে হোমস আসে আর রোমানদের অনেক বড় বাহিনী প্রস্তুত করে। সে মুসলমান আমীরদের মোকাবিলার জন্য পৃথক পৃথক আমীর নিযুক্ত করে। শত্রুর প্রস্তুতি দেখে মুসলমানদের ওপর, যারা অনেক এগিয়ে গিয়েছিল আর যাদের কেউ কেউ ততটা ঈমানও রাখত না, তাদের উপর ত্রাস ছেয়ে যায়। তখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৭,০০০। এমন পরিস্থিতিতে হযরত আমর বিন আস নির্দেশ দেন যে, তোমরা সবাই একস্থানে সমবেত হয়ে যাও কেননা ঐক্যবদ্ধ অবস্থায় তোমাদের সংখ্যা স্বল্প হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের পরাজিত করা সহজ হবে না। অর্থাৎ বিরোধী বাহিনীর মোকাবিলায় তোমাদের সংখ্যা যদিও স্বল্প কিন্তু যদি সমবেত হয়ে যাও তাহলে

তোমাদের বিরুদ্ধে সহজে বিজয় লাভ হবে না। পৃথক পৃথক নেতার অধীনে যদি পৃথক অবস্থায় থাক তাহলে স্মরণ রেখ যে, তোমাদের মাঝে একজনও এমন অবশিষ্ট থাকবে না যে সম্মুখের কারো কোন কাজে আসতে পারে; কেননা আমাদের সবার বিরুদ্ধে বড় বড় বাহিনী নিযুক্ত করে দেয়া হয়েছে। অতএব ইয়ারমুক নামক স্থানে সব মুসলমানের সমবেত হওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। হযরত আবুবকরও মুসলমানদের এই পরামর্শই প্রেরণ করেন এবং বলেন যে, সমবেত হয়ে এক বাহিনীতে রূপ নাও আর মুশরেক বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হও। তোমরা আল্লাহ্‌র সাহায্যকারী। আর আল্লাহ্ তার সাহায্যকারী যারা আল্লাহর সাহায্যকারী। আর তিনি তাকে লাঞ্ছিত করবেন যে তাঁকে অস্বীকার করেছে। তোমাদের মতো মানুষ সংখ্যাস্বল্পতার কারণে কখনো পরাজিত হতে পার না। হযরত আবু বকর (রা.) সংবাদ পাঠিয়েছেন যে, নিঃসন্দেহে তোমরা সংখ্যায় স্বল্প কিন্তু যদি ঈমান থাকে এবং সম্মিলিতভাবে কাজ কর তাহলে কখনো তোমরা পরাজিত হতে পার না, কেননা তোমরা আল্লাহর খাতিরে যুদ্ধ করছ। তিনি বলেন, দশ হাজার বরং ততোধিক লোকও যদি পাপের সমর্থক হয়ে দণ্ডায়মান হয় তাহলে দশ হাজারের হাতে অবশ্যই পরাজিত হবে। সংখ্যা নিয়ে উৎকণ্ঠিত হয়ো না, কেননা তোমরা যদি দশ হাজার হয়ে থাক বা এরচেয়েও বেশি হও, কিন্তু এরা যদি দুষ্কৃতকারী হয় এবং কুকর্মশীল হয় তাহলে অবশ্যই পরাজিত হবে। তাই তোমরা পাপ হতে আত্মরক্ষা কর, নিজেদেরকে পবিত্র কর এবং একতাবদ্ধ হয়ে যাও, ঐক্য সৃষ্টি কর এবং ইয়ারমুকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার জন্য একত্র হয়ে যাও। তোমাদের মধ্য থেকে প্রত্যেক আমীর নিজ নিজ বাহিনীর সাথে নামায আদায় করবে। হিজরী ১৩ সনের সফর মাস হতে রবীউস্ সানী পর্যন্ত মুসলমানরা রোমান বাহিনীকে অবরোধ করে রাখে যদিও তখনো মুসলমানরা সফলতা পায় নি; তখন হযরত আবু বকর (রা.) হযরত খালেদ বিন ওলীদকে শক্তিবৃদ্ধির জন্য ইরাক থেকে ইয়ারমুক পৌঁছার নির্দেশ দেন। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তখন ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। হযরত খালেদের পৌঁছার পূর্বে সকল আমীর পৃথকভাবে নিজ নিজ বাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করছিল। তখন হযরত খালেদ সেখানে পৌঁছে সকল মুসলমানকে একজন আমীর নির্ধারণ করার উপদেশ প্রদান করেন। এতে সবাই হযরত খালেদ বিন ওলীদকে আমীর নিযুক্ত করে। রোমান সৈন্যের সংখ্যা দুই লক্ষ বা দুই লক্ষ চল্লিশ হাজারের কাছাকাছি বর্ণনা করা হয়। আর অপরদিকে মুসলমান বাহিনীর সংখ্যা ৩৭ হাজার থেকে ৪৬ হাজার বর্ণনা করা হয়। প্রায় পাঁচ ভাগের একভাগ ছিল। রোমান সৈন্যদের ক্ষমতার চিত্র হলো, আশি হাজারের পায়ে বেড়ি পরানো ছিল এবং চল্লিশ হাজার মানুষ শেকলাবদ্ধ ছিল যেন প্রাণ দেয়া ছাড়া পালানোর ধারণা তাদের মাথায়ও না আসে। এক লক্ষ বিশ হাজার মানুষ এমন ছিল যাদেরকে এজন্য বেঁধে রাখা হয়েছিল যে, তারা শুধু যুদ্ধ করবে এবং মরবে এছাড়া আর কোন পথ নেই এবং চল্লিশ হাজার মানুষ নিজেদেরকে নিজেদের পাগড়ির সাথে বেঁধে রেখেছিল এবং আশি হাজার অশ্বারোহী এবং আশি হাজার পদাতিক সৈন্য ছিল। অসংখ্য পাদ্রি সৈন্যদেরকে রণে উদ্বুদ্ধ করার জন্য রোমান সৈন্যদের সাথে ছিল। এই যুদ্ধের সময় হযরত আবু বকর (রা.) জামাদিউল উলায় অসুস্থ হন এবং জামাদিউল উখরায় ইন্তেকাল করেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। হযরত খালেদ এই যুদ্ধে মুসলমান সৈন্যদেরকে অনেক ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছেন এর সংখ্যা ৩৬ থেকে ৪০ বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তারা এক আমীরের অধীনে যুদ্ধ করছিল। এসব উপদলের একটির তত্ত্বাবধানে ছিলেন হযরত উতবা বিন রাবিআ। হযরত খালেদ বলেন, শত্রুর সংখ্যা অনেক বেশি, কিন্তু আমাদের এই বিন্যাসের কারণে

মুসলমান-বাহিনী বাহ্যত শত্রুর চোখে বেশি প্রতীয়মান হবে। ইসলামী সেনাবাহিনীর গুরুত্ব এ থেকে অনুমান করা যায় যে, প্রায় এক হাজার এমন বুযুর্গ বা জ্যেষ্ঠ সাহাবী এই সেনাবাহিনীতে ছিলেন যারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর চেহারা দেখেছিলেন। একশত এমন সাহাবী ছিলেন যারা বদরের যুদ্ধে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সহযোদ্ধা হিসাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন। উভয়পক্ষের মাঝে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শুরু হয়। ঠিক তখনই মদীনা থেকে এক দূত সংবাদ নিয়ে আসে, ঘোড়সওয়ার সদস্যরা তার পথ রোধ করে (খবর জানতে চায়)। তখন সে বলে, সব ভালো আছে। কিন্তু প্রকৃত ঘটনা ছিল, সে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ নিয়ে এসেছিল। তারা এই দূতকে হযরত খালেদের কাছে উপস্থিত করে এবং সে চুপিসারে হযরত আবু বকর (রা.)-এর মৃত্যু সংবাদ দেয়। আর সৈন্যদেরকে যা বলেছে তা-ও বলে দেয় যে, আমি তাদেরকে কিছু বলিনি। হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ তার কাছ থেকে পত্র নিয়ে নিজের তূণ-এ (বা তীর রাখার স্থানে) রেখে দেন। কেননা, তার আশঙ্কা ছিল, যদি সৈন্যরা এ সংবাদ অবগত হয় তাহলে বিশৃঙ্খলা ছড়ানোর ভয় আছে, মুসলমানরা হয়তো সেভাবে যুদ্ধ করবে না। যাহোক, মুসলমানরা অটল-অবিচল থাকে এবং সন্ধ্যা পর্যন্ত চরম যুদ্ধ হয়। অবশেষে রোমান সৈন্যরা পলায়ন করতে আরম্ভ করে। এই যুদ্ধে এক লক্ষের অধিক রোমান সৈন্য নিহত হয় এবং মোট তিন হাজার মুসলমান এই যুদ্ধে শাহাদত বরণ করেন। এসব শহীদের মাঝে হযরত ইকরামা বিন আবু জাহলও ছিলেন। কায়সার যখন এই পরাজয়ের খবর পেল তখন সে হোমস অবস্থান করছিল, সে তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

ইয়ারমুক বিজয়ের পর ইসলামী সেনাবাহিনী পুরো সিরিয়াতে ছড়িয়ে পড়ে আর কিনাস্ত্রীন, ইন্তাকিয়া, জুমা, সারমীন, তিযীন, কুরুস, তাল আযায, যুলুক, রাবান ইত্যাদি স্থানে অতি সহজেই বিজয় লাভ করে।

আজ এ কয়জন সাহাবীরই স্মৃতিচারণ করার ছিল। এখন হয়ত রমজানের পরই পরবর্তী স্মৃতিচারণ হবে। আগামী সপ্তাহে রমজানও শুরু হতে যাচ্ছে, ইনশাআল্লাহ্।

এখন আমি এক প্রয়াত ব্যক্তির স্মৃতিচারণ করব। জমুআর নামাযের পর এক ব্যক্তির জানাযা পড়াবো যা কি-না শ্রদ্ধেয়া সাহেবজাদী সাবিহা বেগম সাহেবার। তিনি হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের দৌহিত্রী ছিলেন অর্থাৎ তার জ্যৈষ্ঠ কন্যা এবং হযরত মির্যা রশীদ আহমদ সাহেবের বড় মেয়ে ছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এবং হযরত উম্মে নাসেরের পুত্র সাহেবজাদা মির্যা আনোয়ার আহমদ সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। ৩০ এপ্রিল তারিখে তাহের হার্ট ফাউন্ডেশনে ৯০ বছর বয়সে তার ইন্তেকাল হয়, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ।

সম্পর্কে তিনি আমার মামী ছিলেন। হযরত মির্যা রশীদ আহমদ সাহেব হযরত মির্যা সুলতান আহমদ সাহেবের ছেলে ছিলেন। আর যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের সবচেয়ে বড় কন্যা আমতুস সালাম সাহেবার কন্যা ছিলেন তিনি। হযরত আম্মাজান রাবওয়াতে স্বীয় পরিবারের সর্বশেষ যে বিয়েতে অংশগ্রহণ করেন তা তারই বিয়ে ছিল। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহে.)-এর সহধর্মিনী হযরত সৈয়্যদা আসেফা বেগম সাহেবার বড় বোন ছিলেন। তার আরো এক বোন ও তিন ভাই আছেন। তার বোন আনিসা ফৌজিয়া সাহেবা লিখেন, তিনি পিতামাতার সবচেয়ে বড় মেয়ে ছিলেন, তাই অধিকাংশ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে (আমাদের) পিতামাতা তার মতামতকে বিশেষ গুরুত্ব দিতেন, কেননা তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী ছিলেন এবং তার প্রতি তাদের অগাধ আস্থা ছিল আর তিনিও পিতামাতার আস্থার লাজ রেখেছেন। নিজের ছোট ভাইবোনদের লালনপালন এবং তাদের

তরবিয়তের প্রতি তিনি সচেষ্ট ছিলেন। তিনি লিখেন, আমার সাথে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.)-এর কোন ছেলের বিয়ের কথা হয়, তখন হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এটি ভালো পরিবার, এই পরিবারের দুই বোন আমার বৌ-মা। অর্থাৎ একজন হলেন তিনি যার মৃত্যুর কথা আমি উল্লেখ করছি। আরেকজন হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রহে.)-এর সহধর্মীনি। তিনি বলেন, এই দুই বোন আমার বৌ-মা যারা অত্যন্ত স্নেহশীলা এবং পরিবারকে ঐক্যের বাঁধনে আবদ্ধ কারিনী। তার ছেলে লিখেন, আমার শ্রদ্ধেয়া মাতা অত্যন্ত সাদাসিধে, দরিদ্র মানুষের লালনকারিনী এবং যে কারো সুখদুঃখের সাথী ছিলেন। তিনি আন্তরিকতার সাথে অভাবীদের প্রয়োজনের বিষয় অনুভব করতেন, তাদের প্রতি যত্নবান ছিলেন, দরিদ্রদের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীলা ছিলেন। তাদের কথা শুনে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়ে পড়তেন, তার পক্ষে যতটা সম্ভব হতো তিনি সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন। তার বৈশিষ্ট্য–সংক্রান্ত এসব কথা কোন অত্যুক্তি নয়। তিনি তার বাড়ির কাজের লোকদের সাথে অতি উত্তম ব্যবহার করতেন বরং তার এক কন্যা লিখেন, তিনি তাদেরকে স্বীয় সন্তানের মতো প্রতিপালন করতেন। এক নারী গৃহকর্মীর বিয়ের সময় সে বলে, আমারও তেমন গহনাগাটি চাই যেমন গহনাগাটি আপনি আপনার কন্যাকে দিয়েছেন; আর পরে তিনি তাকে সেরূপ গহনাগাটি বানিয়েও দেন।

তার তিন কন্যা এবং একজন পুত্র রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার ফযলে তিনি মূসীয়া ছিলেন। গতকালই তার জানাযা হয়েছে এবং বেহেশতি মাকবেরাতে সমাহিত হয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লা তার সন্তানসন্ততিকেও তাদের শ্রদ্ধেয়া মাতার পূণ্যকর্মগুলো অবলম্বন করার তৌফিক দান করুন এবং পরস্পরের সাথেও ভালোবাসা ও আন্তরিকতাপূর্ণ সহাবস্থানের সৌভাগ্য দান করুন এবং জামা'ত ও খেলাফতের সাথে সর্বদা গভীরভাবে সম্পৃক্ত রাখুন। (আমীন)